মহান অলি
আশেকে রছুল (সঃ)
হযরত শাহ্ সাহেব
কেবলা (রহঃ)

প্রিন্সিপাল দীন মুহম্মদ মানিক

Chunati.com
Pioneer in village based website

মহান অলি-আশেকে রছুল (সঃ)
হযরত
শাহ্ছাহেব কেবলা (রহঃ)

-প্রিন্সিপাল দীন মুহম্মদ মানিক।

" আল্লাহ যারে বড় করে, সে জানেনা সে কেমন করে উঠছে,
যে ফুল নিয়ে সবাই খুশী, সে জানেনা সে কেমন করে ফুটছে।"

অলিকুল শিরোমনি, আশেকে রছুল (দঃ) শাহ্ শাহেব কেবলাকে উপলক্ষ করে আমার লেখা এ গানটির দু'টি লাইন তার সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

পরিচিত স্বত্তার পরিচিতি নিয়ে পরিমিত জ্ঞানে পরিশীলিতভাবে পরিপক্ষ প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে পরিতৃপ্ত নয়।

তদুপরি প্রিয়জন মহান ব্যক্তিটি যদি পরিবার বা বংশভূক্ত কেউ হন, তাহলে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বর্ণনাতেও সংশয় জাগে-"পাছে লোকে কিছু বলে'। শাহ সাহেব কেবলাকে নিয়ে আমার লেখার প্রয়াসও সে পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত.....।

পিতামহের দিক হতে বেঁচে থাকা বংশগত বয়োজেষ্ঠ্যর একজন হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে বেশকিছু জ্ঞাত থাকা স্বাভাবিক হলেও এ নিবন্ধে সবকিছু লিখার অবকাশ নেই। শাহ সাহেব কেবলার জীবনীগ্রন্থ সংকলনের কর্ণধার পরম শ্রদ্ধেয় ও স্নেহভাজন আত্মীয় নিবেদিত ইতিহাস গবেষক জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর একান্ত আগ্রহকে মূল্যায়ন করে আমি বইটির নূতন সংস্করণে হাজির হলাম মাত্র। ভবিষ্যতে পরম করুনাময় আল্লাহ তওফীক দিলে এ মহান অলিকে নিয়ে স্মৃতিচারন ও আত্মশুদ্ধির দিক নির্দেশনামূলক একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশের বাসনা অধমের আছে।

শাহ্ সাহেব কেবলাকে নিয়ে জীবনী প্রকাশের দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষিত প্রথম বৈঠকে ঘনিষ্ট মহল কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার্য্য মানসিকতার শিকার হয়ে আমি প্রথম সংকলনে অনিচ্ছা সত্বেও সংযতভাবে নিজকে সরিয়ে রেখেছিলাম। এতে অবশ্য 'বিপরীতে হিত' হয়েছে। তত্ব ও তথ্য প্রদানের ঝুঁকি ও কৈফিয়ৎ থেকে বেঁচে গেছি আমি....। জীবন বা ইতিহাস কারো জন্যে থেমে থাকে না। প্রিয় সম্পাদক দক্ষতার সাথে এ গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। জনাব চৌধুরী একজন অভিজ্ঞ সুলেখক এবং সংগঠক। সর্বোপরি নিঃসন্দেহে তিনি অলিভক্ত মানুষ। দায়িত্ব অর্পিত হলে তিনি সেটা পালন করেই ছাড়েন। স্বীকার করি, শাহ সাহেব কেবলার একনিষ্ট ভক্ত হলেও জীবদ্দশায় তিনি তাঁর নিত্য সান্নিধ্যে বেশী ছিলেন না। তাই তথ্য উপাত্ব সংগ্রহ করে শাহ্ ছাহেব কেবলার সংকলনটি বের করতে তাঁকে অনেক কঠিন ও সন্তর্পনে কাজ করতে হয়েছিল। মূল্যবান শ্রম ও সময় ক্ষেপন করে নিঃস্বার্থভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটিতে শাহ সাহেব কেবলার জীবনের মোটামুটি একটি সম্যক ধারনা পেতে অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই একই কথা 'চর্বিত চর্বন' করে উৎসুক পাঠকের বিরাগভাজন হতে চাই না। তবে এ যুগের প্রবীন ও নূতন প্রজন্মের জানার স্পৃহাকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু বিবেচ্য তথ্য সন্নিবেশিত করে সাময়িক দায়ক্তুক্ত হতে চাই।

হযরত শাহ ছাহেব কেবলার জন্মস্থান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলাধীন লোহাগাড়া উপজেলারর অর্ন্তগত চুনতি গ্রামে। যেখানে তিনি চিরশায়িত আছেন। তাঁর মূল নাম হাফেজ আহমদ। পিতার নাম হাজী ছৈয়দ আহমদ এবং মাতার নাম হাজেরা খাতুন। কোলকাতার আলীয় মাদ্রাসা থেকে তিনি লেখাপড়া শেষ করেন। দুই সহোদরের ঘরে পিতামহের সূত্রে আমরা একই দাদার নাতি। আবার তিনি আমার ভগ্নিপতিও বটে (বড়বোনের জামাই)। তাই বয়সের অনেক ব্যবধান সত্বেও পারিবারিক সূত্রে তাঁকে কাছে থেকে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছে।

আমাদের পিতামহের বিশাল জমিদারী ছিল বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) আকিয়াবে (বর্তমান রাখাইন প্রদেশ)। বার্ধক্য জনিত কারণে আমার বাবা সেই জমিদারী দেখাশুনার দায়িত্ব ত্যাগ করে দেশে চলে এলে তদস্থলে জামাতা ও ভাইপো শাহ ছাহেব কেবলাকে সেখানে পাঠানো হয়। জমিদারী দেখাশুনার সাথে সাথে আমাদের বাপদাদার মত তিনিও সেখানে জামে মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। দেশ বিভাগ হয়ে জমিদারী উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পরিবারের কোন না কোন মুরব্বি সেখানে সে দায়িত্ব পালন করতেন। শাহ ছাহেব কেবলার বেলায়েতের সূত্রপাত হয়

সেই বার্মার আকিয়াবে। মুরব্বিদের কাছে জানতে পারি তিনি সেখানে রমজান মাসে পবিত্র শব-ই-কদর প্রাপ্ত হন। সেই থেকে তিনি অপ্রকৃকিতস্থ হয়ে পড়েন। উনার ছোট (সহোদর) ভাই মরহুম মৌলভী ছালেহ আহমদ নিজের হাতের সাথে উনার হাতে শিকল বেঁধে তৎকালীন দূর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে দেশে নিয়ে আসেন। আসার সময় ষ্টীমারে উনাদের এহেন অবস্থার কারণ জেনে এক ফুঙ্গি (মগের ঠাকুর) ছালে দাদাকে বলেছিলেন "ইনি কোন সাধারণ পাগল নন। উনাকে কষ্ট বা দূর্ব্যবহার করিও না। এককালে দুনিয়ার লোক উনার প্রতি আকৃষ্ট হবে.................।" বলা বাহুল্য এটাই ছিল শাহ ছাহেব কেবলা সম্পর্কে প্রথম ভবিষ্যৎবানী।

প্রত্যেক কিছুর সৃষ্টি, স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠার বেলায় তার প্রসব বেদনা থাকে। রাষ্ট্র, ইতিহাস, সভ্যতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সবার বেলায় কথাটি প্রযোজ্য। একজন মহান অলিও এর উর্দ্ধে নয়। মানুষ সহজেই কাউকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। অনেক যাচাই-বাছাই, কাঠ্খড় পুড়ানোর পর এ স্বীকৃতি আসে। শাহ্ ছাহেব কেবলার বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা ছিলেন একজন সহজ সরল, অনাড়ম্বর আত্মভোলা মানুষ। আল্লাহ ও রছুলের প্রেমে এতই মসগুল থাকতেন যে, দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম মাফিক চলাফেরা তাঁর কাছে আশা করা যেত না। আহার-নিদ্রা, স্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদির কোন ঠিক ঠিকানা ছিলনা। নির্জনতা, অন্ধকার এবং বেশিরভাগ বন জঙ্গল ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই ছিল তাঁর পছন্দ। বুজর্গীর প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত গরম 'হালতে' ছিলেন। সারাক্ষণ আপনমনে না'আত, গজল ও বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করে যেতেন। কদাচিৎ লোকালয় বা বাড়ীতে এলে ভয়ে লোকজন দূরে দূরে থাকত। কাকে কখন কি বলে (গালাগাল), কোন্ জিনিস তছনছ করে, তার কোন ইয়াত্তা থাকত না। তাই তাঁকে আসতে দেখলে লোকজন ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন ঝামেলা এড়ানোর জন্য।

পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং উনার এহেন 'মজ্জুবী হালতের' কারণে বড়বুবু ছেলেমেয়ে নিয়ে (জামাল ও আমেনা) আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। শাহ ছাহেব কেবলাকে কাছে পেলে তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে গায়ের ময়লা জামা বদলিয়ে ধুয়ে দিতে ও নাপিত ডেকে দাঁড়িগোফ ছাটাই করে গোসল করাতে দেখতাম। আমরা তখন অনেক ছোট। আমাদের সাথে কিন্তু কখনো গরম মেজাজ দেখাতেন না। শুনেছিলাম জামাল, আমেনা ছাড়াও তাঁদের সংসারে আর একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। বাল্যাবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ***এ ছিল সবেধন নীলমনি নিজঘরে পরবাসী বড়বুবুর সংসার।***

ক্ষুদ্র পরিসরে বড়বুবুর সংসার জীবনের ত্যাগ ও ধৈর্য্যের কাহিনী অনুলেখ্য রেখে এখন সামান্য আলোকপাত করতে চাই একজন কামেল বুজর্গ হিসেবে শাহ ছাহেব কেবলার জীবন নিয়ে। দুনিয়াবী লোভ লালসা ত্যাগী এ মহান অলি চাইতেন না মানুষ তাঁর পিছে পিছে ঘুরুক। কিন্তু প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে একদিনের জন্যও মানুষ তাঁর পিছু ছাড়েনি। তিনি যতই চেয়েছেন নির্জনে থাকতে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে লোক সমাগম। আখেরাতের শান্তির চেয়ে দুনিয়াবী মকছুদে মানুষ তাঁর কাছে আসতো বেশী। মানুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় বড়ই হিসেবী। লাভের হাতছানি না পেলে কেউ বিনিয়োগ করতে চায়না। অলিউল্লাহ গণের দরবারে অকাতরে দিয়ে যাওয়ার যে ব্যাপার আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখি, সে ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য, যদিও তাঁরা (অলিগণ) আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী নন।

তিনি নিজকে বড় করে দেখাতে কখনো চাননি। চেয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর হাবিব রছুল (দঃ) কে সন্তুষ্ট করতে এবং এ জন্যে কিছু করে যেতে। তাইতো ***তিনি প্রবর্তিত করে গেছেন ১৯দিন ব্যাপী পবিত্র সীরত মাহফিল***। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে অনুরোধ করবো, যারা কখনো ঐতিহাসিক এ মাহফিলে আসেননি, অন্তত একবার এসে আত্মোপলব্দিতে এর ব্যবস্থাপনা দেখে যেতে। এখানে নেই বাদ্যবাজনা, লালসালু আবৃত গর—, চেমা, শিরকী কার্য্য কলাপ। নেই তাকিয়া সাজিয়ে জৌলুস, মিছিল...........। নেই কফ্থুথু, কবর সেজ্দা, পবিত্র গোছল শরীফের(?) প্রচলন.....। আছে কর্মসূচী অনুযায়ী প্রসিদ্ধ ওলমায়ে কেরামের মহানবী (সঃ) এর জীবন বিশেষণধর্মী আলোচনা আর আছে ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ ও মেহমানদারী। এমনকি তাঁর মাজারে গদ্দীনশীন বা দানবাক্স জড়িয়ে ধরে নেই কোনো মোতাওয়াল্লী.........। তাবিজ-কবচ, পানিপড়া, শিরনি মানত ইত্যাদি নিয়ে ভন্ডামী করতেও দেখা যায় না কাউকে............। অলিউল্লাহগণের অবর্তমানে স্বার্থন্বেষী মহলের পেটপুঁজার জন্য সৃষ্ট তাবৎ কু-সংস্কার থেকে নিজ ও সীরত সহ অনুষ্ঠেয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহকে (শব-ই-মেরাজ, শব-ই-কৃদর ইত্যাদি) পবিত্র রাখার তাগিদ অনুভব করে তিনি চুনতি মাদ্রারাসাকে কামিল পর্যায়ে উন্নীত করে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন কোরান-হাদীসের আলোকে তাঁর প্রবর্তিত মাহফিল সমূহের প্রতি সুনজর রাখতে........।

শেষ জীবনে একটি মোটর দূর্ঘটনায় শাহ ছাহেব কেবলার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইন্তেকালের সময় তিনি নিজের বা পরিবারের জন্য তেমন কিছুই রেখে যাননি। রেখে গেছেন দুনিয়ার অগণিত ***ধর্মপ্রান মানব জাতির জন্য প্রায় ১৫.০০ একর বিস্তৃত সুরক্ষিত এক বিশাল মাঠ, যা সীরত ময়দান হিসেবে পরিচিত।*** এখানে আছে এক বিশাল মসজিদ,

সীরতের কর্মকান্ড পরিচালার জন্য অফিস, খাওয়ার প্যান্ডেল, মুসাফির খানা ও অন্যান্য অবকাঠামা। মসজিদের দক্ষিণ পাশে ১৯৮৩ইং সনে চির শায়িত এ মহান অলি। সব মিলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক স্বর্গীয় পরিবেশ এবং চুনতিকে দিয়েছে সুষমামন্ডিত ঐতিহাসিক মর্য্যাদা.....।

পরিশেষে এ মহান অলিকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করে লেখা শেষ করতে চাই। ১৯৬৭ইং সনের দিকে অসুস্থতা বোধ করলে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমার হৃদরোগ ধরা পড়ে। তখন এ দেশে এর উন্নত চিকিৎসা না থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাঁচানোর আশা ত্যাগ করে আমাকে বিদায় দেয়। বাড়ীতে গিয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে বড়বুবু ও শাহ ছাহেব কেবলা গিয়ে আমাকে তাদের (বর্তমান) বাড়ীতে নিয়ে আসেন। দিন দিন আমার অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছিল। আমার এহেন দুরবস্থা দেখে তৎকালীন স্থানীয় ডাক্তারগণের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের ব্যবস্থা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু শাহ ছাহেব কেবলা আমাকে শহরে নিতে রাজী হচ্ছেন না এবং যেহেতু আমাকে অক্সিজেন দিয়ে চিকিৎসা চালানো প্রয়োজন, সেহেতু শাহ ছাহেবের বাড়ী না থাকা অবস্থায় এম্বুলেন্স এনে আমাকে শহরে নিতে হবে। সেই সময় তিনি (শাহ ছাহেব) গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এক ভক্তের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে। ডাক্তারদের এ সিদ্ধান্ত রূহানী শক্তি দিয়ে অবগত হয়ে তিনি সামনে আনীত খানাপিনা ত্যাগ করে সোজা বাড়ী চলে এলেন। তখন কি গরম 'হালত' তাঁর.....। ডাক্তারসহ সবাইকে সাতগোষ্ঠির উদ্ধার করছেন গালিগালাজ করে। ডাক্তারগণ পেছনের দরজা দিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, "অনেক দূরে অবস্থান করেও যিনি সব জানতে পারেন, তাঁর কথা ঠেলে রোগীকে (আমাকে) যেন শহরে না নেয়া হয়। আমাদের (ডাক্তারী) চিকিৎসা এখানেই শেষ। আল্লাহর কাছে চেয়ে হায়াত বাড়ানোর জন্য শাহ ছাহেব মামুর ইচ্ছার উপর তাকে সৌপর্দ করুন।"

তারপর বলতে গেলে অনেক কথা। যাহোক ধীরে ধীরে তাঁর ঐকান্তিক দোয়ায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বিবাহ সংসারসহ দীর্ঘ কর্মজীবনের দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছি এবং সর্বোপরি শোকরিয়া যে, আজো বেঁচে থেকে এ লেখার মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি.....।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতের অনন্ত কালেও যেন তাঁর মাজার ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিরুপ সমালোচনার উর্দ্ধে থাকে.....। তাঁর বংশধরগণ জীবিকা নির্বাহের জন্যে যেন মাজার নির্ভরশীল না হয় এবং মাজারের স্বকীয়তা বজায় রেখে সম্মানজনক জীবন যাপন করে।

লেখক ঃ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, চুনতি মহিলা (ডিগ্রি) কলেজ।